অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে

হায়াৎ মামুদ

সম্প্রতি সংবাদপত্রে অবিশ্বাস্য ও মর্মান্তিক এক খবর পড়ে ওঠা গেল। দুই সন্তান তাদের জন্মদাতাকে হত্যা করেছে। এমন পৈশাচিক ঘটনা কদাচিত হলেও এদেশে কখনও কখনও যে ঘটে না এমন নয়। সে-সব ক্ষেত্রে বৈষয়িক ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধি কারণ হিসেবে পিছনে কাজ করে। সংবাদ পাঠ বা শ্রবণমাত্রেই শরীর শিউরে ওঠে জগৎসংসারের মলিন ক্লেদাক্ত নিয়মের কথা ভেবে। ঘোর কলি, ঘোর কলি! কলিকালে এমন না ঘটলে কলিকাল আর বলেছে কাকে? কিন্তু এই সংবাদটি বড়ই ব্যতিক্রমী। বিষয়সম্পত্তি কি জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ ইত্যাদি পঙ্কিল বাস্তবতা প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করেনি। কী ছিল তবে ওই পিতার হঠকারী কর্ম যা অপরাধ বলে গণ্য হল ছেলে দুটির কাছে? অপরাধ এই যে, ভীতসন্ত্রস্ত পিতা পুত্রদ্বয়েরই কল্যাণের কথা ভেবে তাদের বাঁচাতে মৌলবাদী সন্ত্রাসের পথ ছাড়তে বলেছিলেন। ভেবে নিতেই পারি, হয়তো বড়ই নাছোড়বান্দা ছিলেন ভদ্রলোক, জোরাজুরি করছিলেন এতটাই যে ছেলেরা উত্ত্যক্ত বোধ করেছিল।

পুত্র কর্তৃক পিতৃহননের সমান্তরাল, কিন্তু উল্টো, অন্য একটি কাহিনী পাই। সেটি পিতা কর্তৃক পুত্রহননের ঘটনা। মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে (বাইবেলের 'পুরাতন নিয়ম') এবং তা থেকে মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থে তা স্থান পেয়েছে ঃ কোরবানির উৎসবিন্দু। স্বর্গীয় দাক্ষিণ্যে ও আশিসে শেষাবধি পুত্রের জীবনরক্ষা ও পিতার স্রষ্টাপ্রেম প্রতিষ্ঠা পায় মর্ত্যভূমে, তাও আমরা জ্ঞাত আছি। বাংলাদেশের অতিসাম্প্রতিক এই ঘটনা ও মধ্যপ্রাচ্যের কাহিনীর উভয়ের মধ্যে কতিপয় সাধারণ লক্ষণ বিদ্যমান যা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, চিন্তার কেন্দ্রভূমি বিশ্বস্রষ্টা যে নামেই তাকে ডাকা হোক; দ্বিতীয়ত, হননকর্মে তার অনুমোদন উৎসাহ যদি নাও বলি; তৃতীয়ত, ধর্মপুরাণে ভালবাসার প্রতিযোগিতায় নিজে পিতা হয়ে আত্মজের প্রাণ তুচ্ছ ভাবতে হল বিশ্বপিতাকে জয়ী করাবার তাগিদে, আর বাংলাদেশে পিতাকে হত্যার করল তারই শোণিতবাহী দুই সন্তান তাকে বিশ্বপিতার প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে। পার্থক্য সামান্য আছে অবশ্য ঃ প্রথমত, বিশ্বপিতা নিশ্চিতভাবেই অদৃশ্য ও নিজে সন্তান প্রজননে অনীহ এবং বঙ্গসন্তানদ্বয় পঞ্চভৌতিক দেহধারী জনৈক মনুষ্যের সন্তান ও পিতৃহত্যার জন্য প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত নয়; দ্বিতীয়ত, মধ্যপ্রাচ্য-কাহিনীটি বিশ্বপিতার প্রত্যক্ষ আদেশসংশিস্লষ্ট এবং এর ভেতরে মানুষ ও তার স্রষ্টার সম্পর্কের প্রত্যাশিত আবেগ-অনুভূতির চিত্রায়ন আছে, অধিকন্তু নৃশংসতা নয়, স্রষ্টার অপার করুণা সেখানে বিঘোষিত হল।

তবে, কোন বিবেচনায় পিতৃঘাতক দুই সন্তান অমন রোমহর্ষক হত্যাকা ঘটাতে প্রণোদিত হল? তারা তাদেরই পরম হিতাকাপক্ষী জনককে কোরবানি দিল; কিন্তু এক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের অনুরূপ ফল ফলেনি, বেচারা বাবা পুনরুজ্জীবিত হননি। কলিকালে এমনটি ঘটে না, ঘটবার কথা নয়, পাষ দুটি জানত।

আমাদের যা চিন্তা করার বিষয়, তা হল ঃ ওই ছেলে দুটোর মনোজগতের বিন্যাস কী-রকম হতে পারে? তাদের মনের গড়ন যে 'স্বাভাবিক' নয় তা তো বলাই যায়, কারণ স্বাভাবিক হলে 'আলস্নাহর প্রেমে পিতৃবধ' বাংলাদেশী মুসলমানদের ধর্মীয় কৃত্য হিসেবে মান্যতা পেয়ে যেখানে-সেখানে যখন-তখন ঘটতে থাকত। এখন প্রশ্ন আসে, ওদের মনের স্বভাবসঙ্গত কাঠামো ভাঙচুর হওয়ার পিছনে ক্রিয়াশীল হয়েছিল কোন চিন্তা বা মনষ্ক্রিয়? ওদের মনের জমি তৈরি হয়ে উঠেছিল কোন ধরনের অ-স্বভাবী মালমসলা দিয়ে, সেগুলো তারা পেয়েছিল কোথা থেকে, কে বা কারা সরবরাহ করেছিল সে-সব?

এর পরেই এক অবশ্যম্ভাবী অনুসন্ধান মনের সুস্থিরতা বিপর্যস্ত করে দেয় ঃ যে-কোন মহৎ চিন্তা বা বিশ্বাস কাউকে হত্যার অধিকার দেয় কি না। চিন্তা বা বিশ্বাসের মোহনীয়তা শনাক্ত করার সঙ্গে মনুষ্যত্ববোধ ও সভ্যতাজ্ঞানের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদি তা-ই হয়, তা হলে মনুষ্যত্ব ও সভ্যতা সম্পর্কে যে-চৈতন্য বিশ্বস্রষ্টাকে নিয়ে অনুভূতি বা বোধ বা তার কাছে আত্মনিবেদনকে ‘মহৎ চিন্তা’ বলে বিবেচনা করে, সেখানে কোন হননের স্থান থাকা সম্ভব নয়। যে-কোন হত্যা দূষ্য, ও সে-কারণেই দণ্ডনীয়, যেহেতু তা মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার যাবতীয় অর্জনকে নাস্তিতে নিয়ে যায়।

বাংলাদেশে এই মুহূর্তে ‘ধর্ম’ নামক দর্শনাশ্রয়ী, সামাজিক আচরণনির্ভর ও অধ্যাত্মবোধসর্বস্ব গভীর ও জটিল বিষয়টি মহাসঙ্কট সৃষ্টি করছে। ইসলাম ধর্মও এই কাঠামোর ভেতরেই পড়ে। একজন মুমিনের অধ্যাত্মবিশ্বাস, চিন্তাবিমুখ সাধারণ মুসলমানের ধর্মীয় আচরণনিষ্ঠা এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ঐসলামীয় দর্শনচিন্তা ইত্যাদির মধ্যে বিভাজনরেখা, স্বাধিকারের সীমানা, দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা ও তর্কবিতর্ক নিয়ে আমাদের সমাজ বা রাষ্ট্র কিছুমাত্র চিন্তাভাবনা করে এমন প্রমাণ কোথাও দেখি না। অন্যথায়, এসব মননধর্মিতার অনুশীলন প্রতিফলিত হত সভ্য আচরণে, পরমসহিষ্ণুতায়, মানবতা-আশ্রয়ী সামাজিক আচরণে, ব্যক্তির ধর্মবুদ্ধিতে এবং রাষ্ট্রের আচরিত নীতিজ্ঞানে। বাংলাদেশে এদের অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না।

এবং সংকটের সৃষ্টি এই বাস্তব অবস্থা থেকেই। আমরা, এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী, ধর্মকে কেবল একটিমাত্র ক্ষেত্রে চিন্তা ও ব্যবহার করতে চাইছি ঃ সৃষ্টি বা নির্মাণ নয়, সংহার ও ধ্বংস। এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হল বাংলাদেশে ধর্মীয় (এক্ষেত্রে শুধুই ইসলামী) মৌলবাদের জঙ্গি উত্থান। শাসকগোষ্ঠী যেমনই বলুন ও বাইরের দুনিয়াকে বোঝাতে চান যে বাংলাদেশ মধ্যপন্থী সহনশীল মুসলিম দেশ, আমরা তো জানি যে কথাটি সর্বৈব মিথ্যা। মিথ্যাকথনে অন্যের কাছে মুখরক্ষা হলেও হতে পারে, যতক্ষণ-না কে ধরে ফেলে; কিন্তু নিজের কাছে মিথ্যে বলা অনিবার্য চূড়ান্ত সর্বনাশ ডেকে আনে। বাংলাদেশ, সর্বাধিক দুশ্চিন্তার বিষয় হল, রাষ্ট্র হিসেবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে ধর্মীয় জঙ্গিবাদকে রাষ্ট্রনীতি হিসেবে গ্রহণ করার যাবতীয় লক্ষণ দিন দিন স্পষ্ট করে তুলছে। ইসলামী মৌলবাদী জঙ্গি দল, যদি সংবাদপত্রের খবর ভুল না হয়, তো প্রায় প্রত্যেক দিনই নিত্যনতুন আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং তারা সকলে অমিতবিক্রমে তৎপর রয়েছে। আর সর্বশেষ লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরুচ্ছে মুসলমানদেরই একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদীদের জিহাদ ঘোষণায় এবং সবই সরকারি আনুকূল্যজ্ঞাপক মৌনতায়।

এই বাস্তবতা কোনও সভ্য ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আচরণের সঙ্গে মেলে না। বাংলাদেশ ঘোষণা করে দিক যে তার সভ্যতার সনদ ভিন্ন ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে তার তুলনা অসমীচীন এবং বাংলাদেশে গণতন্ত্র নেই, তা হলে আর কোনও প্রশ্নই উঠবে না। না হলে বাংলাদেশকে একধর্মীয় মুসলিম দেশ করার নীলনকশায় অমুসলিম সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায় ও জাতিসত্তাকে বিতাড়িত করার প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলে কী প্রকারে, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তিকে অকার্যকর রাখা, আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন বা বিতাড়ন, আইনাতিরেক আইন চালু করে প্রশ্নবিহীন ‘ক্রসফায়ারে’ মানুষ খুন ওরফে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ইত্যাদি অজস্র প্রসঙ্গ নিয়ে দেশে-বিদেশে প্রশ্ন উঠবেই। আমরা সর্বত্র আজ সভ্যতাহীন (‘অসভ্য’ শব্দ তো গালাগাল, তাই) দেশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছি; মুখে কেউ বলছে না, কাজেকর্মে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

বর্তমান বাংলাদেশের এই কঠিন বাস্তবতা আমরা কতটুকু উপলব্ধি করি, কিংবা করলেও কতটুকু দুঃখিত বা লজ্জিত হই, জানি না। বাংলাদেশ ও আমরা নিজেরা ‘ভাবমূর্তি’ জিইয়ে রেখে কতখানি বাঁচতে চাই, সে-বিষয়েও আমি নিশ্চিত নই। কারণ দেশ, জাতি, রাষ্ট্র, মানুষ সকলে ভয়াবহ এক সংবেদনশীলতার শিকার, সর্বাঙ্গীন অসাড়ত্বে ভুগছি। এর মূল কারণ দেশপ্রেমহীনতা। আর তার পশ্চাৎবর্তী কারণ ইতিহাসজ্ঞানের অভাব, কিংবা ভুল ইতিহাসপাঠ।

২.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয় ১৯৭১ সালে। যে-অঞ্চলটি নিয়ে এই রাষ্ট্র, ১৯৭১-এর পূর্বে তার অন্য একটি নাম ছিল ঃ পূর্ব-পাকিস্তান; দ্বিখণ্ডিত 'পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র' রাষ্ট্রের একাংশ। এই একই ভূখণ্ডের নাম ছিল পূর্ববঙ্গ ('ইস্ট বেঙ্গল'), ১৯৫৬ পর্যন্ত। তবে পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে নয়, পাকিস্তানেরই অংশ হিসেবে। তার পূর্বে ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন এক প্রদেশ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এবং তারও আগে এখানে ছিল নবাবী রাজত্ব, মুসলিম শাসন। সকলের জানা তথ্য পুনর্বার স্মরণ করাতে হল এই সত্য স্পষ্ট করার জন্য যে, কোন ভূখণ্ডের রাষ্ট্রসীমানা নানাবিধ কার্যকারণে পাল্টাতেই পারে, নামেরও পরিবর্তন সম্ভব, কিন্তু এ-সবের কোনওটাই ওই দেশের জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবন ও অনুভবের ধাঁচ আঙ্কিক নিয়মে স্তব্ধ করে দিয়ে অন্য খাতে প্রবাহিত করতে পারে না। বাঙালি জাতিসত্তাকে কী নামে রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের ('ভারতীয়' '৪৭-পূর্ব সময়ে, 'পাকিস্তানি' '৪৭-'৭১ পর্যায়ে, 'বাংলাদেশি' '৭১ উত্তরকালে) তকমা পরানো হচ্ছে সেটি এই জনগোষ্ঠীর কেজো পরিচয়ের একটি রূপ বটে, তবে তা কোনওক্রমেই বংশপরিচয়ের হদিস তুলে ধরে না।

এখানেই বাঙালি মুসলমানের বিপর্যস্ত ইতিহাসজ্ঞানের কথাটি এসে পড়ে। বাঙালি জাতিসত্তার অভ্যন্তরে এই বিশেষ ধর্মগোষ্ঠী যে তাদের আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্ব নিয়ে আজও বিড়ম্বনায় ভুগছে তার অন্যতম কারণ দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ। দ্বিজাতি-তত্ত্ব যে একটা ভুল হিসেব ছিল এবং সে-ভুলটিই ইতিহাস সংশোধন করার চেষ্টা করল ১৯৭১ সালে আর তার ফলেই পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামো থেকে বাঙালি মুসলিম বেরিয়ে এসে, মনে রাখতেই হবে যুদ্ধ করে জয়ী হয়ে বেরিয়ে এসে, তাদের নিজের বেঁচে থাকার জন্য ভিন্ন একটি রাষ্ট্র নির্মাণে বাধ্য হল ইতিহাসের এই অধ্যায় যদি বিস্মৃত হই, তাহলে আবার কোনও একটা সময় ইতিহাস সে-ভুল ফের নিশ্চয়ই শোধরাবে, তবে তার জন্যে পুনর্বার দেশবাসীকে রক্ত দিতে হবে। জাতিসত্তা এক হলেও ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র হতেই পারে, আরব জগৎ তার একটা প্রমাণ, বাঙালি জাতিও তেমনি একটি প্রমাণ। আরব জাতিসত্তার ভেতরে কেবল মুসলমান নেই, খ্রিস্টানরাও রয়েছে। তাই, জাতিসত্তাকেন্দ্রিক রাষ্ট্র তৈরির চিন্তা প্রথমত যথার্থ নয়; দ্বিতীয়ত, জাতিসত্তার ব্যাপারটি ধর্মকেন্দ্রিক নয়, তৃতীয়ত, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ভিতরে বাঙালি জাতির বাইরে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী রয়েছে, নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে তারা একাধিক জাতি; এবং চতুর্থত, ধর্ম ও জাতিসত্তা সমার্থক ভেবে নিলে আমাদের এই খুদে রাষ্ট্রটিতে অন্তত পক্ষে ছ'-সাতটি জাতি রয়েছে ঃ মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, প্রকৃতি-পূজক (আদিবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়) ও বাহাই এবং সম্ভবত জৈন ধর্মাবলম্বীও গুটি কয়েক পরিবার, আমি ঠিক নিশ্চিত নই।

বাংলাদেশের জনসম্পদের এই জটিল নক্সাটি হয়তোবা কারও চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে না। যদি পড়ত, তা হলে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ এক জনগোষ্ঠী সভ্যতাবর্জিত অসহিষ্ণু আচরণ করতে পারত না, আজ যা করছে। খুবই লক্ষণীয় বিষয়, বাংলাদেশে এ মুহূর্তে ইসলামের যে ক্রুদ্ধ, মমতাহীন ও স্বেচ্ছাচারী রূপ সমাজের সমস্ত স্তরে প্রকাশিত হচ্ছে তা ঘোষিতভাবে ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান আমলে আমরা কখনও প্রত্যক্ষ করিনি। বাংলাদেশ কিন্তু সাংবিধানিকভাবে গণতান্ত্রিক, মনে রাখা জরুরি। এ ঘটনাটিও হৃদয়ঙ্গম করা সকলেরই অবশ্যকর্তব্য যে, পাকিস্তানের ইসলামী রাজত্বে বসবাস করার দীর্ঘকালীন অভ্যাস সত্ত্বেও নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়নি; এবং হয়নি তার কারণ, আমি বিশ্বাস করি, বঙ্গবন্ধুর প্রবল রাষ্ট্রনৈতিক নীতিজ্ঞান ঃ যে-দেশ বহু ধর্মের লোকের, শত শত বছর ধরে আবাসভূমি সে-দেশে বিশেষ একটি ধর্মের মানুষ-জন সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে প্রাধান্য পেতে পারে না, যদি পায় তা হলে সেটিই ঐক্য বিনাশ করবে। প্রবল আবেগের বশবর্তী হয়ে তিনি তার বহুজাতিক রাষ্ট্রকে শুধুই বাঙালিদের জন্য নির্ধারণ করে যে ভুল করেছিলেন তার খেসারত বাংলাদেশকে এখনও দিতে হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা তার প্রমাণ।

বাংলাদেশের জনবিন্যাসে আদিবাসীরা পার্বত্যভূমির ও সমতলভূমির উভয়তই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, এ সত্য এখনও অস্বীকার করতে চাইছি।

৩.

বাংলাদেশের বাঙালির অন্তগত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার, মনোজগতে ধর্ম-জাতি-রাষ্ট্র ইত্যাদি নিয়ে চিন্তার যে একদেশদর্শিতা রয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে দেশ চালনার ক্ষেত্রে। একদেশদর্শী হলে নিরপেক্ষতা নষ্ট হতে বাধ্য। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ হতেই হয়, সেটিই গণতন্ত্রের শক্তি। বাংলাদেশের সংকট সেদিক থেকে দেখতে গেলে গণতন্ত্রের সংকট। সংবিধানে 'গণতন্ত্র' আছে, আমাদের মুখের বাচনিক অভ্যাসে 'গণতন্ত্র' কথাটি বুলি হিসেবে আছে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে সব সময়ই এ দেশটি কখনও রাষ্ট্রপ্রধানের, কখনও প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত নির্দেশে পরিচালিত হয়ে আসছে; তাদের ইচ্ছা ও কথাই আইন, তারা আইনের অধীন নন, আইন তাদের অধীন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চলন এমন হয় না, এ হল একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রের লক্ষণ। সকলের ইচ্ছাকে বিবেচনায় না এনে একমাত্র নিজের ইচ্ছাকে বলবৎ করার আকাঙ্ক্ষা স্বৈরাচারী মননক্রিয়ারই অনিবার্য ফসল।

'সমস্ত শক্তির উৎস জনগণ' কথাটি বাংলাদেশের শাসকবর্গের বিশ্বাস-প্রসূত উচ্চারণ নয়। কারণ, জনগণ যে শাসকগোষ্ঠীর হিসেবের মধ্যে নেই তা দেশবাসী বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে টের পাচ্ছে। এবং এর ভয়ঙ্কর ফল এটাই হচ্ছে যে, দেশের কোনও মানুষ কোনও রাজনৈতিক নেতাকে, রাষ্ট্রপরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনও আমলাকে, আজ মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না। কারণ তারা দেশের ভিতরে রাজনীতির যে- দুর্বৃত্তায়ন ও মেধাবী মানুষজনের যে শঠতার শিকার হয়েছে তাতে তাদের জীবন, সহায়সম্পদ, সামাজিক অধিকার ও নাগরিক সম্মান প্রতিনিয়ত নষ্ট হচ্ছে। এই প্রবল মাৎস্যন্যায়ে নিশ্চয়ই সুবিধাভোগী মুষ্টিমেয় কিছু লোকের লাভ হচ্ছে, কিন্তু তার ফলে সমাজের আচরণবিধিতে নীতিহীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শক্তিই একমাত্র এবং অন্যকে ধ্বংস করেও নিজে টিকে থাকা কোনও সভ্য সমাজের অনুশাসন নয়, বর্বরতার ধর্ম। ক্ষমতাবানের (সে-ক্ষমতার উৎস যাই হোক) প্রবল পেশিশক্তির কারণে আমরা রাষ্ট্র হিসেবে ক্রমশ সভ্যতার বাইরে চলে যাচ্ছি। নারীনির্যাতনের পরিসংখ্যান, অন্যের এমনকী রাষ্ট্রেরও সম্পত্তি গ্রাস, আইনের অবমাননা, শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা ও সন্ত্রাস রাষ্ট্রের প্রশ্রয়ে জনগণের চিন্তায় ও আবেগে সংবেদনহীনতা জন্মে দেওয়া এসব হল 'সভ্যতা'হীনতারই বাহ্যলক্ষণ।

এর মূল কারণ দেশ বা রাষ্ট্রের চিন্তার মধ্যে আমরা মানুষকে স্থান দিইনি। ফলে, মনুষ্যত্বের চর্চা রাষ্ট্রনীতির মধ্যে ঠাঁই পায়নি এবং ব্যক্তিমানুষও রাষ্ট্র ও সমাজের প্রভাবে তা ভুলে যাচ্ছে। দেশ মানে তো মানুষ। মানুষকে নিয়ে ভাবনা না থাকলে দেশ নিয়ে চিন্তা থাকার কথা নয়। মাথার মধ্যে 'দেশ' নেই, অথচ দেশপ্রেম আছে এমন অযৌক্তিক কথা কে কবে শুনেছে। বাংলাদেশের মানুষ দেশপ্রেমিক কি-না হিসেব করার এক মোক্ষম নিক্তি আছে কত বাংলাদেশি বেআইনিভাবে বিদেশে আছেন, বেআইনিভাবে হলেও বিদেশে যেতে চাইছেন এবং বেআইনিভাবে কত লোক প্রত্যেক দিন বিদেশি দূতাবাসগুলোয় ধর্ণা দিয়ে পড়ে আছে তার খতিয়ান নেওয়া।

এক সময়ে বাঙালির গর্ব ছিল মাতৃভূমির গর্ব। তার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, শিল্প ও সাহিত্য, মেধাবী মননশক্তির গর্ব। আমরা সব ধ্বংস করতে করতে যে-জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি তাতে আজ বাংলাদেশের বাঙালি আত্মপরিচয় দিতে লজ্জা পাচ্ছে। এই রূঢ় বাস্তবতা স্বীকার করে নিলে হয়তো আরেক আত্মবিকাশের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার শক্তি সঞ্চয় করা যেতে পারে। কিন্তু, খেটে খাওয়া মানুষজন যাদেরকে বুদ্ধিমান ও যোগ্যতর বলে মনে করে তারা এখনো আত্মতৃপ্ত।

মানবভাগ্যকে ইতিহাসগতিই নিয়ন্ত্রণ করে। দেশপ্রেমহীন আত্মতৃপ্তি কতদূর পর্যন্ত যায় সেটুকু দেখবার জন্য দেশবাসী অপেক্ষা করে আছে।